গুজরাট - ২০০২

প্রগতি মাইতি

এখনো কেন্দ্রে ও গুজরাট রাজ্যে বি জে পি সরকার আছে - ভারতবর্ষ বলিয়াই ইহা সম্ভব

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মূলত কংগ্রেসের পতাকাতলে যুক্ত থাকা ডানপন্থী নেতৃত্ব ও স্বাধীনোত্তর ভারতে সুদীর্ঘকাল ঐ কংগ্রেসের বংশ পরম্পরায় শাসন এবং একেবারে হালফিল সময়ে উগ্রহিন্দু জাতীয়তাবাদী বি জে পির দৌলতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অসংখ্য নজির বহন করে চলেছে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। 'গুজরাট- ২০০২' - একটি নবতম সংযোজন।

এদেশের সংবাদপত্রগুলি সামাজিক দায়বদ্ধতা একশো ভাগ পালন করে একথা অবশ্যই সত্যি নয়। সুতরাং 'গুজরাট-২০০২' তেও যথারীতি সংবাদপত্রগুলি বিপ্লবীয়ানার স্বাক্ষর বহন যে করবে না- তাও পরিষ্কার। তবু চক্ষুলজ্জার খাতিরে যতটুকু সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, তার ময়না তদন্ত করলে 'গুজরাট-২০০২'-এর কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে না পারার কারণ নেই। তাই খুব প্রাসঙ্গিক কারণে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা (অবশ্যই প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে) কিছু ঘটনার দিকে পাঠকের দৃষ্টি চালিত করতে হচ্ছে।

প্রথমেই গোধরা কান্ডের দু'দিন আগে (২৪ ফেব্রুয়ারি) লোহার রড দিয়ে ঐ একই ট্রেনে মুসলমানদের বেদম প্রহার করা হয়েছিল। মুসলিম মহিলাদের বোরখা টেনে খুলে ফেলা- এমনকি শিশুরাও ঐ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এই খবরটি উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রকাশিত 'জনমোর্চা' নামক একটি অখ্যাত কাগজে ছাপা হয়েছিল।

২৭ ফেব্রুয়ারি যেদিন সবরমতী এক্সপ্রেসের ঘটনা ঘটেছিল সেদিন ঐ ঘটনা ঘটার অব্যবহিত আগের ঘটনা হলো- ' ফেব্রুয়ারির ঐ সকালে সবরমতী এক্সপ্রেস যখন গোধরা স্টেশনে থামল, কিছু করসেবক চায়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। তারা আযোধ্যা থেকে ফিরছিল, এবং সকলের হাতে ছিল ধারালো ত্রিশূল। তারা সবাই চা খেল। তারপর চায়ের দাম দিতে অস্বীকার করল। হকাররা দাম চাইতেই তারা স্টেশন কাঁপিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল- 'জয় শ্রীরাম'। ত্রিশূল উঁচিয়ে হকারদের আক্রমণ করতে তেড়ে গেল। করসেবকদের আচমকা ঐ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হকাররা আপাতত চলে যায়।

দ্বিতীয়ত গোধরার ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। এমনও কথা শোনা যাচ্ছে যে- পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী বাহিনীতে বেছে বেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সমর্থকদের চাকরী দেওয়া হয়েছে এবং তাদের হিন্দুত্ববাদে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরে দাঙ্গা প্রায় সারা গুজরাট ছড়িয়ে পড়েছে। দাবী উঠছে যে স্থানীয় প্রশাসন দাঙ্গা মোকাবিলায় ব্যর্থ। কার্যত প্রশাসন দাঙ্গা দমন করতে মোটেই আন্তরিক নয়- এই সহজ সত্য বুঝতে দেরী হচ্ছে। যাই হোক ঘটনার পরবর্তী কালে সংবাদ দর্পণের দিকে তাকানো যাক। South Asian Network For Secularism & Democracy (SANSAD), কানাডাতে প্রেরিত ৩ মার্চ-২০০২ এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেখাচ্ছে- '...গুজরাটের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। অলস ও নীরব দর্শকের ভূমিকায় বসে রইল প্রশাসন, আর তাদের সামনেই ঘটছে নৃশংস গণহত্যাকাণ্ড। ....যা ঘটেছে তা কিন্তু হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব নয়, অথবা হিন্দু-অহিন্দুর দ্বন্দ্বও নয়; হিন্দু ধর্মের নামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এস এস, শিবসেনা ও বজরং দলের মতো কয়েকটি সংগঠন ধর্মমত নির্বিশেষে সমগ্র সাধারণ-মানুষের উপর সংগঠিতভাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করছে।' '.....বাস্তবে পুলিশ উন্মত্ত দুষ্কৃতীদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন চেষ্টাই করেনি, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে তাণ্ডবে হাত মিলিয়েছে।'

'গত ১ মার্চ শুক্রবার, গুজরাটের বরোদায় পুলিশ, নামাজ পাঠরত মুসলিমদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে....। যেমন কলোনী, ঈযাকুবপুরা এবং মকরপুরা থেকে মুসলিমরা যখন মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছিল, তখন পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ মানুষগুলিকে যখন তাদরে আত্মীয়-বন্ধুরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন বিশ্বহিন্দু পরিষদের লোকজন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করে। সরকারী উর্দিপরা পুলিশ সরাসরি এভাবে দাঙ্গায় আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করার নজির সত্যিই বিরল। বেছে বেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের স্বেচ্ছাসেবকদের যে পুলিশের চাকরী দেওয়া হয়েছিল এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই- তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার বি জে পি'র নীতির ধারাবাহিকতাতেই যে 'গুজরাট-২০০২' এর সৃষ্টি- তা বুঝে নিতে হবে। উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে যখন সাধারণ মানুষ বিধানসভার ভোটে বি জে পিকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে, যখন অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা বাজেট সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি অনুপ্রবেশ (অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে) ঘটিয়ে দেশীয় শিল্পের নাভিশ্বাস ঘটাচ্ছে, বেসরকারীকরণের রমরমা আবহাওয়া সৃষ্টি করে কর্মহীনের সংখ্যা বাড়াচ্ছে, সাধারণ মানুষের ওপর একটার পর একটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে মানুষের জীবন জেরবার করছে, শরিকী কোন্দলে ঘরে-বাইরে শত্রুর মোকাবিলা করতে অটলবিহারীর ওষ্ঠাগত প্রাণ- তখন, হ্যাঁ ঠিক তখনই 'গুজরাট-২০০২'- অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পিত এবং আমাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে বাহিত করার সুচতুর ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আবার একটু পেছনের দিকে যাওয়া যাক। গুজরাটের গণহত্যার ওপর People's Union for Civil Liberties তার মার্চ-২০০২ এর রিপোর্টে তুলে ধরেছে, পাঠকের মনোযোগ খুব প্রাসঙ্গিকভাবে সেদিকে আকর্ষণ করা উচিত। একটি পুস্তিকা গোধরা কান্ডের পর প্রচার করা হয়েছিল। 'True Hindu

Patriot ' এর নামে ঐ পুস্তিকাতে সমস্ত মুসলিমদের সম্ভাব্য সবরকমভাবে বয়কটের কথা বলা হয়েছে। বয়কটের কয়েকটি পদ্ধতিও উল্লেখিত আছে। কোন কিছু ভাড়া না দেওয়া, তাদের কোন পণ্য বিক্রি না করতে এবং মুসলিম অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনীত সিনেমা না দেখতে। তারা যদি এগুলি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের হনুমান ও রামের নামে ভয়ও দেখানো হয়েছে। ওঠ! জাগো! হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ। জয় শ্রীরাম ধ্বনি নিয়ে এগিয়ে যাও। এর লক্ষ্য হলো হিন্দুদের উদ্বুদ্ধ করা এই কথা বলে যে- 'মুসলিম নৃশংসতা' সহ্য করা বন্ধ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে মুসলিমরা হিন্দুদের পীড়ন করে আসছে। তাদের বিদ্ধে জেগে ওঠার সময় হয়েছে। পরমহংসের নামে সহি করা হয়েছে এই পুস্তিকাটি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের অত্যন্ত গোপনীয় একটি চিঠি ঃ ৩৪টি পথনির্দেশ, যেগুলির মধ্য দিয়ে ওদের খতম করতে হবে। যেগুলির অন্যতম হলো সমস্ত সংখ্যালঘুদের ক্ষতি করা /হত্যা করা/ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। ঐ পদ্ধতিগুলি এরকম- স্লো পয়জন করে নবাগত শিশুদের মেরে ফেলা এবং এক্ষেত্রে হিন্দু ডাক্তারদের তালিকাভুক্তকরণের মধ্য দিয়ে। সমস্ত সেকুলার প্রোগ্রাম বয়কট কবা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে মদ ও ড্রাগ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। এবং সেসব কার্যপদ্ধতি নাগপুরস্থিত অফিসে জানাতে হবে যাতে প্রয়োজনে তারা ওখান থেকে তথ্যাদি ও অন্যান্য নির্দেশাবলী দিতে পারে।

কমল চিনয় (জওহরলাল নেহে ঝিবিদ্যালয়ের অধ্যাপক), এম. পি শুক্লা (প্রাক্তন ফিনান্স সেক্রেটারী), কে এস সুব্রামনিয়ম (ত্রিপুরা পুলিশের প্রাক্তন ডি জি) বেং অচিন ভানাইক (লেখক) - এই চারজনের তথ্য-সংগ্রাহক একটি দল গুজরাট সফর করেছিলেন। ঐ দলের অন্যতম অচিন ভানাইক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন-

'.....Conscious use was then made of this incident to inflame communal passions leading to the sustained attacks from February 28 onwards on Muslims, carefully targeted throughout the cities and rural areas of Gujarat. The connecting link was provided by the Visha Hindu Parishad call for a bandh which, in the circumstances, was clearly aimed at promoting communal hatred. Worst of all, this bandh, instead of being opposed and prevented, was actually supported and endorsed by the Gujatat Goverment. With regard to subsequent violence, the Study clearly concludes that this was a state-wide and state-sponsored programme on a massive scale, which is then rationalised, justified and minimized by the Central Government.'

উপরের উজ্জ্বল লাইনগুলি থেকে আবারও স্পষ্ট হলো যে গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত সরকারের পুরোপুরি মদতেই 'গুজরাট-২০০২'- এর সৃষ্টি। সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে দলীয় স্বার্থে এভাবে প্রশাসনকে ব্যবহারের নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত বুঝি বা এই প্রথম।

বিরোধী দলগুলির একাংশ দাবী করছে (মমতা তাদের মধ্যে অন্যতম) মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ। প্রশ্ন হলো- ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ করা না করার ওপর কি গুজরাটের ঘটনাবলী নির্ভরশীল? নরেন্দ্র মোদীকে 'নন্দ ঘোষ' বানিয়ে এযাত্রা বৈতরণী পার হওয়ার একটা চেষ্টা হলেও হতে পারে, কিন্তু এতে সমস্যার মূল কারণ অন্বেষণ ও তদনুযায়ী দেশব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচী যদি পিছিয়ে পনে তাহলে বি জে পি-র পোয়া বারো। শুধু তাই নয় ভারতবর্ষে ধর্মের পথ ধরে ফ্যাসিবাদ শক্ত জমি পেয়ে যাবে। সুতরাং বিশেষত বুদ্ধিজীবিদের এবিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

আলকায়দা তথা লাদেনকে একসময়ে নানাভাবে সাহায্য ও ইন্ধন যুগিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শুধু তাই নয় দেশে দেশে মৌলবাদী শক্তিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত দেওয়ার কাহিনীও সর্বজনবিদিত। গুজরাটের ঘটনার পেছনেও মার্কিনী মদতের বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া বি জে পির মার্কিন প্রীতি বহুবার প্রমাণিত। গুজরাটের ঘটনায় তাই সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত সত্য সত্য থাকলে- উদ্বেগ দ্বিগুণ হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত অগ্রগতি হলেও মানুষের চিন্তা চেতনায় তার প্রভাব তেমন করে আজও পড়েনি। ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসন- যেগুলি মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে- তার প্রভাব শুধুমাত্র অশিক্ষিত মানুষকেই নয় তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদেরও আচ্ছন্ন করছে। এই দোষে শুধুমাত্র শিক্ষিত হিন্দুদেরই দুষলে হবে না, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ও সমান দোষে দুষ্ট। তথাকথিত শিক্ষিত বহু খৃষ্টান ও মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আপ্লুত হতে দেখা যায়। এই একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় সম্ভ্রান্ত এক খৃষ্টান মহিলাকে বলতে শোনা যায়-'গীর্জায় এসে প্রার্থনা করলে মনের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়, যখনই আমার জীবনে দুঃখ-যন্ত্রনা আসে আমি গীর্জায় এসে বসে থাকি।'- এও কি এক ধর্মীয় মৌলবাদ নয়? ঐ খৃষ্টান মহিলার আবার চিবোধ ও ন্যায়অন্যায়বোধ দেখলে অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন বলেই মনে হবে। আসলে প্রশ্নটা হিন্দুমুসলমান বা খৃষ্টান- এভাবে নয়, আমরা সবাই মানুষ, মনুষ্যত্বই আমাদের ধর্ম-এই মানবতাবাদী ভাবনা জাগ্রত না হলে সাম্প্রদায়িকতার নখর থেকে মুক্তি অসম্ভব। আর তাই যেখানে যে সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বা প্রভাব বেশি থাকবে সে-ই অধিকতর ক্ষমতার অপব্যবহার করবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরী আন্দোলন বিপথগামী হবে। গুজরাটের ঘটনা থেকেও যদি আমাদের শিক্ষা না হয়- ভাবীকালের কাছে কৈফিয়ৎ দিতেই হবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com